সেপালকার ইন লাভ!

i-onlinemedia.net/11662

মুহাম্মাদ শিহাব উদ্দিন ইবন তোফায়েল March 3, 5877521

বৈরুত। নামটা ফিনিশিয়দের দেয়া। অর্থ: কূপ। পাঁচ হাজার বছরের পুরনো শহর। প্রাচ্যের পারিস বলা হয় এ-শহরকে। প্রাচ্যের সুন্দর শহরগুলোর মধ্যে বৈরুতের অবস্থান প্রায় শীর্ষে। এখন অবশ্য সুন্দর এই বন্দরনগরী নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ চলছে। শুরু হয়েছে সেই ১৯৭৫ সালে। চলবে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের ধাক্কায় এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ থামবে। ভয়ংকর এই গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল বহু গোষ্ঠী।

.

বৈরুতের রাস্তায় একলোক হাঁটছে। জীর্ণ পোশাক। শীর্ণ দেহ। উস্কুখুস্কু চুল। দীর্ঘদিনের অধোয়ার কারনে দাঁড়িগুলো জট পাকিয়ে আছে। নগ্ন পা। হাঁটছেও ধুঁকে ধুঁকে। এর ওর কাছে হাত পাতছে। সবাই দূর থেকে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। কারন মানুষটা গা দিয়ে সারাক্ষণ বোটকা গন্ধ বের হয়। নাকে হাত চাপা দিয়েও পার পাওয়া যায় না। গোসল করেছে কতদিন হয়েছে, কে জানে! গায়ে চাপানো কোটটার আসল রঙ সেই কবে হারিয়ে গেছে! ময়লার পুরু আস্তরণ জমাট বেঁধে আছে।

.

বৈরুতের কেউ লোকটাকে কখনো কথা বলতে দেখেনি। জিজ্ঞেস করলেও উত্তর মেলে না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দৃষ্টিটাও কেমন যেন! খ্যাপাটে পাগলাটে ধরনের! ঘোলা ঘোলা। অস্থির। তবে এ-অবস্থা সব সময় থাকে না। লোকজন দয়া করে দান করছে। পাগল হলেও লোভী নয়। কেউ দান করলে, তার যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু গ্রহণ করছে। নিতান্ত বাধ্য না হলে গ্রহণ করছে না। কেউ দু'টি রুটি দিলে একটি গ্রহণ করছে। কারন তার একটা দরকার। লোকজন এই নির্মোহ ফকিরের প্রতি সশ্রদ্ধ না হয়ে পারে না। মানুষের মনই এমন; ব্যতিক্রমী কিছু চায়। স্বাভাবিকের বাইরে কিছু পেলে লুপে নেয়। বিস্মিত হয়। আগ্রহী হয়ে ওঠে। সবকিছু চাপিয়ে মানুষটার একটা বৈশিষ্ট্য সবাইকে আকৃষ্ট করে- লোকটার হাসি। পরিধেয় যেমনই হোক, চলনবলন যাই হোক, পাগলামিকে চাপিয়ে, মানুষটার মুখে একটা স্মিত হাসি লেগে আছেই। ছোটবড় সবার সাথে অত্যন্ত ভদ্র আচরণ করে। কথা না বললেও, অসৌজন্যমূলক কিছু করে না। বাচ্চা-কাচ্চা দেখলে করুন চোখে তাকিয়ে থাকে। খাওয়ার কিছু থাকলে শিশুদের দিকে বাড়িয়ে দেয়! ছোটাছুটি করতে গিয়ে কোনও শিশু ব্যথা পেলে, দৌড়ে গিয়ে উঠিয়ে দেয়। রক্ত বের হলে কোলে করে ছুটে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সাথে একটা বেড়ালছানাও থাকে প্রায় সময়। শহরে যত বেড়াল আছে, সবগুলোর সাথেই তার সখ্য। ছোট ছেলেমেয়েদের সাথেও। শুধু একটাই সমস্যা, কথা বলে না। আগে বেশি পীড়াপীড়ি করলে, লিখে উত্তর দিত। এখন তাও দেয় না। দেয়ার প্রয়োজনও পড়ে না। সবাই জানে, পাগলটা সম্পর্কে। তাদের জীবনের এক অভ্যস্ত অনুষঙ্গ হয়ে গেছে পাগলটা। একদিন না দেখলে খোঁজখবর করতে শুরু করে দেয়। তার খাওয়া-দাওয়া হল কি না, চিন্তা করে।

.

তার বিরুদ্ধে কারো কোনও অভিযোগ ছিল না। নিজের কাছে খাবার থাকলে ছোটদেরকে দেয়। রাস্তার কাককে খাওয়ায়। কুকুরকে বসে বসে খাওয়ায়। বেড়ালকে খাওয়ায়। তার বাহ্যিক অবয়ব সুন্দর না হলেও, শিশুরা তাকে ভয় পেত না। সে কখনো মহিলাদের দিকে চোখ তুলে তাকাত না। সারাদিন এদিক সেদিক হাঁটার উপর থাকত। যেখানে রাত হত, মাটিতেই শুয়ে পড়ত।
লোকটার কোটের পকেটে একটা জীর্ণ ছেঁড়াপাতার ডায়েরি থাকে। লেখা থেকে বোঝা যায়, একজন নারী ছিল এই ডায়েরীর মালিক। ডায়েরীর মধ্যে অস্পষ্ট ঝাপসা একটা স্টিল ফটোগ্রাফও আছে। বিবর্ণ মলিন। একটা পরিবারের ছবি। শাদাকালো। কারো চেহারাই পরিষ্কার বোঝা যায় না। পাগলটা সময় পেলেই চবিটার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। একটু পর পর ঝাপসা হয়ে আসা চোখ মোছে। তার চোখে পানি দেখে, আশপাশ থেকে কৌতূহলভরে তাকিয়ে থাকা মানুষজনেরও দু'চোখও ভিজে ওঠে! আহা বেচারা! সবাইকেই বোধ হয় হারিয়েছে!

.

প্রথম দিকে পাগলটা কাউকে তার ডায়েরি পড়তে দিত না। দেখ তেও দিত না। কেউ জানতোও না ডায়েরিটার কথা। একদিন হঠাৎ করে বের হয়ে পড়ল। তখনো পাগলটা সর্বজন প্রিয় হয়ে ওঠেনি। দুষ্ট ছেলের দল পাগলকে দৌড়ানি দিয়েছে, পাগলটাও ইট-পাথরের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে মরিয়া হয়ে ছুটে যাচ্ছে। রাস্তার কোনে উঠে থাকা ইটের সাথে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তখনি কোটের পকেট থেকে একটা ডায়েরি বের হয়ে এল। ছেলেরা ডায়েরি নিয়ে ছুট দিল। বড়রা ভীষণ অবাক হয়ে দেখল ডায়েরিতে অনেক

কিছু লেখা। পুরোটা পড়ে, যতটুকু জানা গেল:
= পাগলটার বাড়ি ফিলিস্তীনে। ইহুদিদের কারাগারে বন্দী ছিল। তার একমাত্র বোন ইহুদিদের নির্যাতনের জ্বালা সইতে না পেরে, রাতের আঁধারে পালিয়ে এসেছে। খবর পাওয়া গেছে, সে বৈরুতের কোথাও আছে। ইহুদিরা পরিবারের বাকি সবাইকে মেরে ফেলেছে! কারাগারে টর্চারের কারণে, চিৎকার করতে করতে গলা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বের হয় না। মাথাও সব সময় ঠিক থাকে না। পৃথিবীতে বোনই একমাত্র জীবিত আত্মীয়।

.

এর মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেল। লোকজন প্রচণ্ড উদ্বেগের মধ্যেও ঠিকই পাগলটার দিকে নজর রেখেছে। পাগলটা নির্বিকার! ইসরাঈলি বোমা পড়ছে, বিভিন্ন দলের নানামুখি রক্তক্ষয়ী সংঘাত চলছে। সে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মসজিদে গীর্জায় সিনাগগে সর্বত্র। পাগলটার ধর্ম নিয়ে শুরুর দিকে একটু ধোঁয়াশা ছিল। পরে ডায়েরি পড়ার পর কেটে গেছে। সে একজন ফিলিস্তীনি খ্রিস্টান। জেরুজালেমের ওল্ডসিটিতে তাদের চৌদ্দপুরুষের নিবাস। বৈরুতে এসেছে বোনের খোঁজে! ঘটনার শুরু আরও আগে!

.

গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, বৈরুত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। চতুর্মুখি যুদ্ধে বিধ্বস্ত অবস্থা। এরমধ্যে ইসরাঈলি বাহিনীও এসে যোগ দিয়েছে। কয়েক দিক থেকে তারা হামলা শুরু করেছে। প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলা হল তাদের বিরুদ্ধে। ইহুদিরা পাল্টা আঘাত হানতে নির্বিচারে বিমান হামলা শুরু করল। ইহুদি স্নাইপাররাও ওঁৎ পেতে থেকে হত্যা করল অসংখ্য মুসলিম যোদ্ধাকে। হিংস্র ইহুদিরা ঘটাল সাবরা-শাতিলায় ভয়ংকরতম বর্বর হত্যাকান্ড! অসহায় উদ্বাস্তু ফিলিস্তীনি মানুষগুলো বেঘোরে মারা পড়ল!

.

এতকিছুর পরও পাগল বহাল তবিয়তেই আছে। ঘুরছে ফিরছে। রাস্তায় রাস্তায়। অলিতে গলিতে। এখানে ওখানে। যুদ্ধ তার গতিবিধিতে কোনও পরিবর্তন আনতে পারে নি। সে আছে নিজের মত করে। কেউ কেউ চেষ্টা করেছিল তাকে নিরাপদ বাংকারে লুকিয়ে রাখতে। তাদের সাথে সানন্দে যায়। কিছুক্ষণ থেকে আবার কোন ফাঁকে বেরিয়ে চলে আসে বাংকার থেকে। আটকে রাখা যায় না। ইসরায়েলি সেনারা বৈরুতের পশ্চিমাংশে অবস্থান নিল। লোকজন হায় হায় করে উঠল। পাগলটার আনাগোনা যে ওদিকটাতেই বেশি! নির্ঘাৎ মারা পড়বে। সবাই চিন্তিত! কী হবে অসহায় পাগলটার? ইসরায়েলি পশুগুলোর মনে কি দয়ামায়া বলে কিছু আছে?

.

উৎসাহী দরদি কয়েকজন মানুষ গাগলটার খোঁজে এল। মুহূর্মুহু বিমান হামলা চলছে। ইসরায়েলি কনভয় সাবরা-শাতিলায় গণহত্যা শেষ করে এদিকেই আসছে। পাগলের খোঁজে আসা লোকজন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একটা বহুতল ভবনের ভগ্নাবশেষের আড়ালে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, পাগলটা রাস্তার পাশে বসে আছে। ইহুদি বাহিনী এগিয়ে আসছে! থেমে থেমে ব্রাশ ফায়ার করে রাস্তা নিরাপদ করছে! যাতে কেউ কাছে ঘেঁষতে না পারে! আহ! বেচারাকে বুঝি বাঁচানো গেল না! তাকে রাস্তার কোল ঘেঁষে বসে থাকতে দেখেই গুলি করবে ইহুদিরা! ভাববে, ফিলিস্তীনি ফিদাঈ! পাগলের ছদ্মবেশে ওঁৎ পেতে আছে!

.

ইসরায়েলি কনভয়ের প্রথম গাড়িটা পাগলটার ঠিক সামনে এসে ব্রেক কষল। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল পুরো কনভয়। একজন পদস্থ অফিসার তড়াক করে জীপ থেকে নেমে সটান স্যালুট হাঁকাল। ব্যাজ দেখে কর্নেল মনে হয়! পাগলটা পিটপিট করে তাকাল। তারপর সীনা টান করে দাঁড়িয়ে হাতকে সামান্য তুলে স্যালুটের জবাব দিল। আশেপাশ থেকে উঁকি মারা লোকেরা তাজ্জব পাগলের ফিটনেস দেখে। অথচ এতদিন লোকটা কী ভীষণ কুঁজো হয়ে ধুঁকে ধুঁকে হাঁটত। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানত না। অফিসারটি পাগলের মুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিল। নিজেই লাইটার জ্বালাল ফস করে। অগ্নিসংযোগ করে দিল। পাগল বলল:

-আবিপ, তোমরা পাঁচ মিনিট দেরি করে ফেলেছ!

-এক জায়গায় এমবুশে পড়েছিলাম! স্যার! আর দেরি করা যাবে না! আপনার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে!

-কিভাবে?

-আপনার বোন!

-তার ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম?

-তাকে পাইনি, তবে মূলব্যক্তিকে পেয়েছি! ব্যবস্থা নিয়েছি!

-গুড! চলো!

পাগলকে সসম্মানে উঠিয়ে নিয়ে পুরো কনভয় আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল! লোকজনের বিস্ময়ে ঠিকরে বের হওয়ার উপক্রম চোখের সামনে দিয়ে!

এক. আমাদের দেশে এমন পাগল কয়জন আছে?

দুই. আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্চ পদগুলোতে এমন পাগলের সংখ্যা কত?

তিন. পোশাকাশাকে পাগলটার মত না হলেও, ধোপদুরস্ত সুস্থ পাগলের সংখ্যা মুসলিম দেশগুলোতে কত হবে?

.

খ্রিস্টানদের কাছে সবচেয়ে পবিত্রতম গীর্জা হল 'কানীসাতুল কিয়ামাহ'। হোলি সেপালকার চার্চ। পুরোনো জেরুযালেমে। খ্রিস্টানদের বিশ্বাসমতে এখানে একটা পাথর আছে, তার উপরেই যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। এখানেই যিশুকে কবর দেয়া হয়েছিল। এ-গীর্জার পাশেই আছে মসজিদে উমার। বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের পর আমীরুল মুমিনীন এখানেই দু'রাকাত সালাতে ফাতহ আদায় করেছিলেন। তার নামাজের জায়গাতেই গড়ে উঠেছে মসজিদ।

সালাহুদ্দীন আইয়ুবি রহ. যখন কুদস জয় করেন, তখন এই গীর্জার দখল খ্রিস্টানদের বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাত লেগে যায়। আর্মেনিয়ান চার্চ, রোমান ক্যাথলিক ও অন্যান্য দল নিজেরা এ গীর্জার ধারকবাহক হতে উঠেপড়ে লাগে। কারো কারো মতে, তখন সালাহুদ্দীনের সরাসরি হস্তক্ষেপে বিবাদ মেটে। তিনি খ্রিস্টানদের সম্মতিক্রমে এক প্রতিবেশি মুসলিম পরিবারের হাতে গীর্জার চাবি তুলে দেন। সে থেকেই 'আলে জাওদাহ' পরিবার বংশানুক্রমে প্রতিদিন গীর্জা খোলে ও বন্ধ করে।

.

বর্তমানে গীর্জার চাবিদার হলেন আবেদ জাওদা। তার বাবা ও দাদাও এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। জাওদা বংশেরই এক সন্তান আলি জাওদাহ। দাদার হাত ধরে আলিও মাঝেমধ্যে গীর্জার দ্বার খুলতে আসে। গীর্জায় কখন কারা পূজা করতে আসবে তার সময় ভাগ করে দেয়া আছে। প্রথমেই আসে 'আর্মেনিয়ান খ্রিস্টানরা'। তারপর আসবে আরেক মতাবলম্বী খ্রিস্টান। এভাবে চলে আসছে।

আজ বৃহস্পতিবার। বিশেষ পূজা হবে সেপালকারে। পুরোহিতদের সাথে সাধারণ মানুষও অংশ নেয়। ভোর চারটা বাজে। আজও বাইবেল পাঠ হয়েছে। বিশেষ পদ্ধতিতে প্রণাম-পূজা হচ্ছে। যাজকদের সাথে অল্প কয়েকটা আর্মানি পরিবার এসেছে। তীর্থযাত্রীদের একজনকে দেখে মনে হচ্ছে, তার আগ্রহ পূজাপাটের চেয়ে অন্য কোনও দিকে। গীর্জার পূজা-পাট অংশ না নিলেও, জাওদা পরিবারের চাবিরক্ষক গীর্জার অভ্যন্তরে কী হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে তীক্ষœ নজর রাখেন। নানা দল নিয়ে কাজ কারবার। হিংসাবশত কেউ উল্টাপাল্টা কিছু করে রেখে গেল, তার দায় চাপবে চাবিধারীরও উপর। এজন্য কড়া পাহারা রাখতে হয়। এরা তাদের পবিত্রতম স্থানে এলেও আসার সময় মনটা পবিত্রতম করে আনতে পারে না। খালি অন্য দলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করবে। তারাই যিশুরু সাচ্চা অনুসারী, বাকিরা ভ-! জাওদা পরিবারকে এসব অহরহ শুনে যেতে হয়। শুনতে শুনতে তাদের কান পচে গেছে।

দাদা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। ভোর চারটায় একা একা আসতে পারেন না। সাথে নাতিদের কেউ আসে। দাদার হয়ে গীর্জার দরজা খুলে দেয়। দাদাকে সঙ্গ দেয়। কথা বলে। পূণ্যার্থীদের আনোগোনা দেখে। চৌকান্না থাকে। আলি জাওদা দাদাকে বসিয়ে এদিক-ওদিক নজর রাখছে। তার চোখ পড়ল, এক সন্নাসীসির উপর। কালো আলখেল্লায় আপাদমস্তক আবৃত। প্রবেশ করার সময় এ কোথায় ছিল? দেখা গেল না যে? সবাই পূজায় ব্যস্ত, সন্নাসিনী দেয়ালের কাছ ঘেঁষে হাঁটছে আর গভীর অভিনিবেশে কী যেন খুঁটে খুঁটে দেখছে। কী দেখছে? নান হয়ে কাজে ফাঁকি? আলি এগিয়ে গেল! তাকে দেখে নানা একটু চমকে উঠল। সাথে সাথে অবশ্য মিষ্টি হাসিতে চোখমুখ উজ্জল। সপ্রতিভ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল:

-আপনি বুঝি দরজার তালা খুলেছেন?

-জ্বি না, আমার দাদাজির কাছে চাবি থাকে! আমি তার সাথে এসেছি! তার বয়েস হয়ে গেছে কি না! একা একা খুলতে পারেন না!

-কিছু মনে না করলে, আমি আসলে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি! আপনাকে বলব?

-আমি গীর্জার কেউ নই!

-জানি। আমার প্রয়োজনটা গীর্জা সংশ্লিষ্ট নয়!

-তাহলে?

— কি আপনাদের পারিবারিক লাইব্রেরীটা একটু দেখতে পারি?

-অবশ্যই পারেন! কিন্তু সেখানে আপনার কী প্রয়োজন? আপনি সেটার কথা কিভাবে জানতে পারলেন?

-আমি খলীল (হেবরন) ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। ইতিহাস আমার সাবজেক্ট। হোলি সেপালকার সহ এখানকার প্রাচীন গীর্জাগুলো নিয়ে একটু পড়াশোনা করব। আমি শুনেছি, সেই সালাদীনের আমল থেকেই আপনাদের পরিবার এখানে দায়িত্ব পালন করে আসছে। যুগে যুগে তাদের কাছে অনেক স্মৃতি অনেক ঐতিহাসিক বস্তু জমা হয়েছে। আমার মনে হয়, লাইব্রেরিটা আমাকে একটু দেখতে দিলে, আমার গবেষণায় অনেক সহযোগিতা হবে। আমার আব্বুও এমনটা মনে করেন। আব্বুই আমাকে আপনাদের পারিবারিক সংগ্রহশালার কথা জানিয়েছেন!

-ও, আপনি তাহলে পেশাদার নান নন?

-পেশাদার না হলেও, অপেশাদারও নই!

-মানে?

-আমরা যারা এখানে আর্মেনিয়ান আছি, তারা পালাক্রমে বংশানুক্রমে যিশুর ঐতিহ্য রক্ষা করে আসছি! পড়াশোনা শেষ করে হয়তো এসে নান হিশেবে যোগও দিতে পারি!

-কিন্তু এমন কথা তো আপনাদের প্রায় সব দলই বলে বেড়ায়! নিজেদেরকে যিশুর আসল অনুসারী বলে!

-অন্যরা কে কী বলে সেটা আমার জানার দরকার নেই! আমাদের আর্মেনিয়ান চার্চই যিশুরু প্রকৃত অনুসারী!

-আচ্ছা আচ্ছা থাক, আমার প্রতি রাগ করার দরকার নেই! আমি নিজ থেকে একথা বলিনি! অন্যরা আমাদের কাছে নালিশ দেয় বলেই

কথাটা পেড়েছি!
-এখন বলুন, আমার পক্ষে কি লাইব্রেরিটা ব্যবহার করা সম্ভব?
-এটা আমি বলতে পারব না। দাদু বলতে পারবেন। চলুন আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাই!
.
এটা ছিল সূচনা! তারপরের ঘটনাগুলো ছাড়া ছাড়াভাবে ডায়েরিতে তারিখসহ লেখা আছে:
৩রা মার্চ, ১৯৭৩
আজ এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। হোলি চার্চে গিয়েছি ভোর চারটায়। উত্তেজনায় সারারাত একফোঁটা ঘুমুতে পারিনি। কখন তিনটা বাজবে, আমরা কখন রওয়ানা দেব। চার্চে যাব। আমার অবশ্য চার্চের প্রতি তেমন আগ্রহ নেই, আমার পরম আরাধ্য বিষয় হল, জাওদা পরিবারের লাইব্রেরিটা। আমার স্যারই এটার সন্ধান দিয়েছেন। তিনি মুসলমান এবং পুরুষ। তিনি যেভাবে লাইব্রেরিতে প্রবেশের অনুমতি নির্বিঘেœ পেয়ে গেছেন, আমি কি পাব? ভাইয়া অবশ্য অভয় দিয়ে বলেছেন:
-তারা শত শত বছর ধরে গীর্জার চাবির দায়িত্ব পালন করে আসছে। তোকে অবশ্যই অনুমতি দিবে। তুই নিশ্চিত থাক, খুশি মনেই পড়তে দিবে! যদি না দেয়, সে দেখা যাবেখন!
.
আমি শুধু শুধুই আশংকা করছিলাম। তারা খুবই ভাল মানুষ। বিশেষ করে আলি। তার সাথে চার্চের করিডোরে দেখা হয়ে যাওয়াটাও বড় ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী ভদ্র আর মার্জিত ছেলে! বৈরুতে পড়াশোনা করে। বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। একদিনেই মনে হয়েছে তাকে চিনে ফেলেছি। সে আমাকে বুড়ো দাদুর কাছে নিয়ে গিয়েছে। তিনি খুশি মনেই অনুমতি দিয়েছেন। আলির ঘাড়েই দায়িত্ব চাপিয়েছেন, আমাকে সহযোগিতা করার জন্যে।
আলি নিজে সাথে থাকতে না পারলেও, তার মা আমাকে বলতে গেলে সারাক্ষণ সঙ্গ দিয়েছেন। কুদসের মুসলিম পরিবারগুলো এত মিশুক হয়, আগে জানতাম না তো! আমার সাথে অসংখ্য মুসলিম ছেলে পড়ে। তাদের সাথে কখনো প্রয়োজনের বেশি কথা হয়নি। তবে সবাইকে ভদ্র হিশেবেই দেখেছি। কিন্তু একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে কখনো যাওয়া হয়নি। আফসোস হচ্ছে, আগে থেকেই কেন পরিবেশটার সাথে পরিচিত হলাম না!
.
১০-ই মার্চ, ১৯৭৪
উফ! গত কয়েকটা দিন কী ছটফটানিইনা গিয়েছে। ভাইয়াকে পইপই করে বলে দিলাম, আমাকে নিয়ে যেতে, তার সময় হলে তো! তিনি কি সব আন্দোলন করে বেড়াচ্ছেন! আজ তাকে আর নিস্তার দিইনি। একদম সাত সকালে উঠেই তার ঘাড়ে চেপে বসেছি। আজকাল জেরুযালেমে এতদূর পথ একা একা যাওয়া যায়? সাথে পুরুষ কেউ থাকলে তবেই ভরসা পাওয়া যায়। যেখানে যাব তার আশেপাশে সবাই মুসলিম। একটু ভয় ভয় করে! পথে পড়ে কয়েকটা ইহুদি পাড়া! গা কেমন ছমছম করে! এই বুঝি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল!
আমার মনে ক্ষীণ একটা আশা ছিল, আজ আলির সাথে দেখা হবে। তার সাথে বৈরুতের পড়াশোনা নিয়ে কথা বলব। আমিও সেখানে যেতে পারি কি না, যাচাই করে দেখব! তা আর হল কই! তার মা বলল, সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়! রাত হলে ডেরায় ফেরে! ভোর হলে আবার চম্পট! দাদুর সাথে গীর্জায়ও যেতে চায় না! তার নাকি গীর্জায় যেতে ভাল লাগে না। শুধু দাদুর কষ্টের কথা ভেবেই যাওয়া! আমার পড়াশোনা ভালই এগুচ্ছে। আরবি কবিতার প্রতি আমার আজন্ম ভালবাসা! আব্বুর প্রিয় কবি হলেন আখতাল। তিনি বনু উমাইয়া যুগের সেরা তিন কবির একজন। খ্রিস্টান হয়েও তিনি মুসলমানদের মাঝে থেকে কাব্যলক্ষীর চর্চা করে গিয়েছেন। তার কবিতা আব্বুর লাইন কে লাইন মুখস্থ। কিন্তু ঘরে তার দীওয়ান ছিল না। শুনেছি বৈরুত থেকে তার দীওয়ান (কাব্যসমগ্র) ছাপা হয়েছে। আলির সাথে আরেকবার দেখা হলে ভাল হয়। একটা দীওয়ানে আখতাল সংগ্রহ করতাম।
আম্মুও কাব্যরসিক! তার প্রিয় কবি হলেন ‘মী যিয়াদাহ’। ১৮৮৬-১৯৪১। আম্মু নারী বলেই হয়তো তার প্রিয় কবিও একজন নারী। মি যিয়াদাহ প্রিয় হওয়ার আরও একটা কারন, তিনি লেবাননের কবি হলেও, কবির মা একজন ফিলিস্তিনী। আম্মুও নাকি একসময় স্বপ্ন দেখতেন, তার প্রিয় কবির যিয়াদার মত জীবনে বিয়ে করবেন না। কাব্যসাধনা করেই জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তা আর হল কই! আমি আ◌াম্মুর কথা শুনি আর হাসি! তাকে রাগানোর জন্যে বলি:
-মী যিয়াদাহ কুমারি থাকার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে! তোমারও কি তেমন কোনও কারণ আছে?
-কী সব আজেবাজে কথা বলিস!
-তুমি জান না, যিয়াদা একজনকে পছন্দ করত?
-কাকে?
-কেন খলীল জিবরানকে? বিশ বছর চিঠি লিখেছে, একজন আরেকজনকে। মজার ব্যাপার হল জীবনে একবারও তাদের দেখা হয়নি। ভাগ্যিশ তোমার এমন দুর্মতি হয়নি! নইলে আমি এত সুন্দর পৃথিবীর দেখা পেতাম না!
.
ঈশ্বর তার দাসের সব খবর রাখেন। আমি যে বহুদিন ধরে দীওয়ানে আখতাল খুঁজছি, এটা ঈশ্বর ছাড়া আর কে জানে? কেউ জানে না!

আজ আলিদের কুতুবখানায় গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল একটা ভলিউমের উপর। জ্বলজ্বল করছে: দীওয়ানে আখতাল। আমি ভীষণ চমকে গেছি! এ-বাড়িতে কাব্যচর্চা কে করে? দৌড়ে আলির আম্মুর কাছে গেলাম। তিনি বোধহয় মিষ্টি হাসি আর আদর ছাড়া কথাই বলতে পারেন না।
-এ-বাড়িতে আখতালের কবিতা কে পড়ে?
-কেন সবাই পড়ে! আলির দাদু পড়ে, আলি পড়ে! আমি পড়ি!
-সবাই কবিতা পড়ে দেখছি! কুতুবখানায় কার কার কবিতা আছে?
-আরবের বড় বড় প্রায় সব কবির দীওয়ানই আমাদের সংগ্রহে আছে। তোমার শুনে ভাল লাগবে, আন্দালুসের নাসারা কবিদেরও কয়েকটা পান্ডুলিপিও এখানে আছে।
-কিভাবে সংগহ হল সেগুলো?
-গ্রানাডার পতনের পর, সেখান থেকে পালিয়ে আসা কিছু ইহুদি পরিবার এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের কাছ থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষরা কিনে নিয়েছেন সেগুলো। তোমার বুঝি কবিতা ভাল লাগে?
-জ্বি, খুবই ভাল লাগে। আম্মু-আব্বুও কবিতা ভাল বাসেন!
.
২০-ই মার্চ, ১৯৭৪
কিভাবে যে দিনগুলো হু হু করে চলে যায়, টেরটিও পাওয়া যায় না। দশটা দিন জীবন থেকে হারিয়ে গেল। বড্ড দোটানার মধ্যে আছি, আমি কি আরবী কবিতা পড়ব নাকি চার্চের ইতিহাস পড়বো? আর অল্প সময়ের জন্যে গিয়ে কিছুই পড়া যায় না। আম্মুর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছিলাম। যদি ও-বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা থাকে, আমি থেকে যাব। একটা ব্যাগে করে কিছু জামা-কাপড়ও নিয়ে এসেছি! আলির আম্মুকে গতবার আকারে ইঙ্গিতে বলেছিলাম। তিনি রীতিমত লুফে নিয়েছেন আমার ইচ্ছাকে!
-থাকতে পারবে মানে? কেন পারবে না! এটা তোমার ঘর! তোমার মত পড়—য়া মেয়ে পেলে আমার খানাপিনাও লাগবে না। সারাক্ষণ কথা বলার মানুষ পাওয়া যাবে! ছেলেটাকে কাছে পাই না। ওর বাবা নেই জানো তো!
-জানি না তো! তার কী হয়েছে?
-তিনি ৬৭র যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আলিই আমার একমাত্র সন্তান। তাকে নিয়েই আমার সবকিছু আবর্তিত।
.
আমি এখন আলিদের বাসায় আছি। গত দু'দিন ধরে। ভাইয়া একবার নিতে এসেছিলেন, আমি পড়ার কাজ শেষ হয়নি বলে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। প্রতিদিনই খুশিমনে ঘুম থেকে উঠি, আজ বুঝি আলির সাথে দেখা হবে! কিন্তু গিয়ে দেখি, সে নেই। ফজরের নামাজ পড়তে গিয়ে আর আসেনি। প্রায় দিনই আসে না। কোথায় যায়, কী করে, মাকে কিছু বলে না। মা শুধু আক্ষেপ করেন, আমি বিধবা হয়েছি, শহীদের স্ত্রী হয়েছি। এবার বোধ হয় শহীদের মা হতে যাচ্ছি।
পরিবারটা অনেক বড়। অনেক সদস্য। সবাই আমাকে খুবই আদর করে। আগ্রহের সাথে সময় দেয়। এ-বংশের মেয়েরা স্কুল-কলেজে যায় না, কিন্তু তারা আমার মত বিশ্ববিদ্যালয় পড়—য়াদেরকে পড়াতে পারবে। আগে মনে করতাম, তারা পড়ে না। এখন দেখি সম্পূর্ণ উল্টো। আমরা খ্রিস্টানরাই পড়ি না। তারা কী পরম মমতায় কুরআন তিলাওয়াত করে। আমরা কি এত যতœ করে বাইবেল পড়ি? আমার কী হয়েছে কী জানি! লাইব্রেরিতে পড়ার চেয়ে আলি আম্মুর সাথে কথা বলতে বেশি ভাল লাগে। তার সাথে অল্পসময় কথা বললে, কয়েকটা বই পড়ার চেয়েও বেশি কিছু জানতে পারি! আমার চেয়ে বয়সে ছোট মেয়েরাও অনেক কিছু জানে। অথচ তারা জীবনেও স্কুলের গ-ী মাড়ায়নি।
.
২৮রা মার্চ, ১৯৭৪
আজ গিয়ে শুনি আলি চলে গেছে। বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। কেন? একবার মাত্র কথা বলা মানুষের প্রতি আমার এত আগ্রহ কেন? আর যে মানুষটা আমাকে এড়িয়ে চলেছে দিনের পর দিন, আমি কথা বলতে গিয়েছি, নানা অজুহাতে পাশ কাটিয়ে গেছে! তার জন্যে আমার মন কেন উতলা হবে? কোনও যুক্তি আছে?
.
বাড়িটাকে আমি বড় ভালবেসে ফেলেছি। আদব-আখলাক, চাল-চলন সবই ভাল লাগে। তাদের দেখাদেখি আমারও এখন মুখ খুলে বের হতে লজ্জা লাগে। সংকোচ বোধ হয়। আলির আম্মু একটা অদ্ভুত কথা বলেছেন:
-তুমি আখতালের কবিতা পছন্দ কর! ইমরাউল কায়সকে খুবই আগ্রহ নিয়ে পড়, খলীল জিবরান ও তার বান্ধবী মী যিয়াদার কবিতাও পড়! তুমি কি জানো, এর চেয়েও সুন্দর কবিতা আরবীতে আছে?
-জ্বি না, তিনি কে?
-আমি যে সাহিত্যের কথা বলছি, সেটা ঠিক কবিতা নয়, তবে পড়লে কবিতার চেয়েও হাজারগুণ বেশি আনন্দ পাবে! তৃপ্তি পাবে! তুমি আগ্রহী থাকলে 'ইনশাদ' (আবৃত্তি) করে শোনাতে পারি! ভাল না লাগলে শুনবে না!

-ভাল লাগবে না কেন? আপনার মুখে আমার দুনিয়ার সবচেয়ে অসুন্দর কথাটাও সুন্দর লাগবে!

-হুম! আখতালের কবিতা পড়ে পড়ে তোমার দেখি প্রশংসায় 'ইতরা'(বাড়াবাড়ি) করার অভ্যেস হয়ে গেছে!

-জ্বি না। আপনাকে আমার কেন যে এত ভাল লেগে গেছে, বুঝতে পারছি না। দেখেন না, আমি এখন এ-বাড়িতে এলে কুতুবখানার চেয়ে আপনার কাছেই বেশি সময় কাটাই! মনে হতে থাকে, কী হবে নীরস কাগজের খসখসে পাতা উল্টিয়ে? তার চেয়ে আপনার জীবনঘেঁষা টসটসে কথাগুলোই আমাকে বড্ড বেশি টানে!

.

আলির আম্মু আমাকে কুরআন কারীম থেকে তিলাওয়াত করে শোনালেন। কী আর বলব! এত সুন্দর! এত সুন্দর! শুধু কথাগুলোই নয়, তার গলাটাও খুউব সুরেলা, কথা বলার সময় টের পাইনি। আমি তার মুখ থেকে কুরআন শুনে বিমোহিত! আমি ছোট বেলা থেকে জেনে এসেছি, কুরআনে শুধু আমাদেরকে ধরে ধরে যবাই করার কথা আছে! আর কিছু নেই! কিন্তু সূরা ত্বহা না কী যেন পড়লেন! এত সুন্দর করে কোনও মানুষ বলতে পারবে না। লিখতে পারবে না। আমি আরবী সাহিত্যের সেই প্রাচীন যুগ থেকে এ পর্যন্ত বহু কবির কবিতা পড়েছি। শুধু কুরআনটাই পড়া বাকি ছিল। ভয়ে ও ঘৃণায় পড়া হয়নি। ভুল হয়েছে! বড় ভুল হয়েছে!

.

১লা মে, ১৯৭৪

অনেকদিন পর লিখতে বসলাম। ভার্সিটিতে পরীক্ষা ছিল। আব্বু অসুস্থ। ভাইয়ার সাময়িক নিরুদ্দেশ অবস্থান। ভাইয়াটা দিনদিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। সব সময় ইহুদিদের সাথে তার ওঠাবসা! আম্মুও ভাইয়াকে সমর্থন করেন। আব্বু অবশ্য ইহুদিদেরকে দু'চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু আম্মু মনে ব্যথা পাবেন বলে কিছু বলেন না। আম্মু কেন যে ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতিশীল,বুঝতে পারি না। তার পরদাদু ইহুদি ছিলেন বলে? কী জানি! যাক, সবমিলিয়ে সময়গুলো খুবই ব্যস্ততায় কেটেছে! অন্য কিছু ভাবার ফুরসত ছিল না। সামনে লম্বা ছুটি। মনের সুখ মিটিয়ে পড়াশোনা করা যাবে। আম্মু আমাকে আলিদের বাড়িতে যেতে দিতে চান না। আমি নাকি কেমন হয়ে যাচ্ছি দিন দিন। আব্বু কৌতুক ভরে জানতে চাইলেন:

-কেমন হয়ে যাচ্ছে মানে?

-আমিও সেটা বুঝতে পারছি না। আগের মতো হৈ হুল্লোড় করে না। প্রতিবেশি খালাত ভাইদের সাথে মেশে না। ঘরের বাইরে যায় না। অগের তুলনায় কেমন যেন ভারিক্কি চালচলন!

-এতে তুমি খারাপের কী দেখলে?

-ভারিক্কি ভাব আসা ভাল! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তার উপর মুসলমানদের প্রভাব পড়ে গেল কি না? আমার মনে হয় তার ওদিকে না যাওয়াই নিরাপদ!

-সে কি ছোট খুকি? তার একটা বুঝ-সমঝ নেই!

.

আচ্ছা কথা তো! আমি কি আসলেই বদলে গেছি? কই না তো! কিন্তু ভার্সিটির বন্ধু-বান্ধবরাও তাই বলল! থাক এসব অপ্রয়োজনীয় চিন্তা। আমাকে যে করেই হোক সে বাড়িতে যেতেই হবে। উফ! কত দিন যাই না! মনে হচ্ছে যুগ-যুগান্তর পেরিয়ে গেছে! আজ যাবোই! ও বাড়ি আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে!

.

৫-ই এপ্রিল ১৯৭৪

আজকাল লিখতে ভাল লাগে না। ঘরে থাকতে ভাল লাগে না। সারাক্ষণ মনে হতে থাকে, আমার মধ্যে কী যেন নেই! আলিদের বাড়িতে গেলে, সেই নেই নেই ভাবটা উধাও হয়ে যায়! কেন? আলি এসেছিল এরমধ্যে একবার! ভেবেছিলাম কথা হবে! কিন্তু তার ভাব-গম্ভীর অবস্থা দেখে, নিজেরই কথা বলার মতি হল না। আর ও-বাড়িতে নারী-পুরুষ সামনা-সামনি কথা বলে না। আমি কেন নিয়ম ভাঙবো। তবে গীর্জা নিয়ে পড়াশোনা কত কী হয়েছে জানি না, আমি এখন কুরআন পড়ছি! আলির আম্মুর কাছে! ভার্সিটির নাম করে, গীর্জার নাম করে, তার কাছে ছুটে আসি। কুরআন পড়তে, গল্প করতে। কবিতাও পড়া হয়। আলির আম্মুই আমাকে একদিন হুট করে বললেন:

-বৈরুত যাবে?

-বৈরুত! কেন?

-না, এমনিতেই!

-আপনি কারণ ছাড়া কোনও কথা বলার মানুষ নন!

-আসলে, প্রশ্নটা আমার নয়, আলির!

-আলির? তিনি আমাকে নিয়ে ভাবেন? ভাবার সময় পান? আমার কথা তার মনে আছে?

-কেন মনে থাকবে না। অবশ্যই মনে আছে! তোমার ভালমন্দ নিয়ে সে অনেক ভাবে!

-কখনো বলেনি তো!

-প্রয়োজন হয়নি, তাই বলেনি। এখন তার মনে হয়েছে, তোমার এখানে থাকার চেয়ে বাইরে থাকা বেশি ভাল, তাই বলেছে! তোমার আব্বু

রাজি হলেও, তোমার আম্মু ও ভাই রাজি হবে না!
-ভাইয়া কেন রাজি হবে না?
-তুমি তোমার ভাইকে কতটুকু চেন?
-ইদানীং তার চলাফেরা কিছুটা সন্দেহজনক হলেও, মানুষ হিশেবে তিনি খুবই ভাল!
-তুমি বোন হিশেবে তাকে ভালো বলবে, এতে দোষের কিছু নেই! কিন্তু তার আসল পরিচয় কি, সেটা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তুমি কি জানো, তোমার ভাই আলিকে হন্যে হয়ে খুঁজছে?
-কই না তো!

—

৬-ই এপ্রিল ১৯৭৪
গতকাল আলির আম্মুর কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম! ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলাম! ভাইয়া আলিকে খুঁজছে? কই ভাইয়া কখনোই আমার কাছে আলি সম্পর্কে জানতে চায়নি। সে যে আলিকে চেনে, তার ভাবভঙ্গিতেও আভাস পাইনি। আলির আম্মু বোধ হয়, হঠাৎ মুখ ফস্কে ভাইয়ার প্রসঙ্গ এনে ফেলেছিলেন। আমি পাল্টা প্রশ্ন করতেই তিনি সম্বিত ফিরে পেয়ে মুখ বন্ধ করে ফেলেছেন। শুধু এটুকু বলেছেন, সময় হলে আমাকে সব বলবেন। তাহলে কি ভাইয়ার অন্য কোনও পরিচয় আছে! যা আলিদের জন্যে বপদজনক? খোঁজ নিতে হতে হবে! ভাইয়া টের না পায় মত করে!
.
আলি কেন আমি বৈরুত যাব কি না জানতে চাইল? সে কি চায় আমি বৈরুত যাই! ওখানে উচ্চতর পড়াশোনা করি! ওখানে আমার এমনিতেই যাওয়া হবে! বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে আব্বু পড়েছেন, দাদু পড়েছেন! ভার্সিটিতে দাদুর বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাস ও প্রাচ্যবিদ ফিলিপ খুরি হিট্টি (১৮৮৬-১৯৭৮)। হিস্ট্রি অব আরব-এর লেখক! দাদু বন্ধুর বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করেছেন। আব্বুও হলে সিট পাওয়ার আগে হিট্টি দাদুর বাড়িতে ছিলেন। তার বাড়ি ছিল বৈরুত থেকে পঁচিশ কিমি দূরে। শেমলানে। আব্বু যখন বৈরুতে পড়াশোনা করতে দিয়েছিলেন, তখন হিট্টি দাদু আমেরিকায়! প্রিন্সটন আর হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। তিনি না থাকলে কী হবে, দুই পরিবারের সম্পর্কটা দৃঢ় একটা ভিতের প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমি বৈরুতে গেলে, ওখানেই উঠব! দেখা যাক কী হয়!
একটা বিষয় আমার কাছে বেশ অবাক লাগে, আমরা হলাম আর্মেনিয়ান চার্চের অনুসারী। অর্থোডক্স খ্রিস্টান। আর ফিলিপ দাদুরা হলেন ম্যারোনাইট। তার মানে ক্যাথলিক খ্রিস্টান! দাদুদের সেই আমলে দুই দলের মধ্যে চরম রেষারেষি বিদ্যমান ছিল! তবুও তাদের বন্ধু হতে সমস্যা হয় নি।
.
৭-ই এপ্রিল ১৯৭৪
গতকাল আলিদের বাড়ি যেতে পারিনি। আব্বু আমাদের সবাইকে এক আন্টির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। নাসিরায় (الناصرة) ইংরেজিতে নাজারেথ!। পাশাপাশি মা মেরি ও যেসাস ক্রাইস্টের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো আবার ঘুরে ফিরে দেখাও উদ্দেশ্য ছিল। নাজারেথে আন্টির নানাবাড়ি! শহরটা আগের মত নিরিবিলি নেই। সারা বিশ^ থেকে সব মতবাদের খ্রিস্টানরা দলে দলে শহরটা দেখতে আসে। মুসলিমরাও শহরটাকে পছন্দ করে। তাদের কোরানেও এ-শহরের ঘটনা আছে। এঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল মা মেরিকে এখানেই পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন! আরও নানা ঘটনা!
.
আন্টি অনেক বড় মানুষ! রোজমেরি সাঈদ। তিনি থাকেন আমেরিকায়। বড় ভাই এডওয়ার্ড সাঈদের মতোই গুণী। ইংরেজি ও আরবী উভয় ভাষাতেই তাদের লেখা বুদ্ধিজীবীমহলে সমাদৃত। তাদের মূল বাড়ি ফিলাস্তীনে হলেও, পিতার সূত্রে মার্কিন নাগরিক। তাদের বাবা সাঈদ ওয়াদী‘ অনেক আগে থেকেই আমেরিকায় বাস করে আসছেন। রোজমেরি আংটি মাঝেমধ্যে দাদার বাড়ি ও নানার বাড়িতে বেড়াতে আসেন।
আব্বু মূলত সাঈদ আঙ্কলের ক্লাশফ্রেন্ড। কুদসের বিখ্যাত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ‘আলমুতরানে’ দু’জনে একসাথে পড়াশোনা করেছেন। সে সূত্রেই আন্টির সাথে পরিচয়। আন্টিও ‘মুতরানে’ ভর্তি হয়েছিলেন।
দাদুর সূত্র ধরে আমাদের সাথে লুবনানের একটা ভাল সম্পর্ক ছিল। সেখানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। রোজমেরি আন্টির আম্মুর জন্মে নাজারেথে হলেও, তার পূর্ব পুরুষ এসেছিলেন লুবনান থেকে। এজন্য আন্টির আম্মু আমার আব্বুকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি বলতেন:
-ওর শরীরে আমার বাবার বাড়ির গন্ধ লেগে আছে! তাকে দেখলে পূর্বপুরুষদের কথা মনে পড়ে!
আব্বু আর আন্টির মধ্যে চমৎকার একটা সম্পর্ক আছে! আম্মুর মধ্যে এ-নিয়ে চাপা ‘কুনকুনি’ আছে বোধ হয়! আন্টি যদি আমেরিকা চলে না যেতেন, তাহলে আন্টি হয়তো আমার মা হতেন। এখনো তিনি আমাকে কাছে পেলে যেভাবে গভীর আবেশে আদর করেন, তাতে মনে হয়, আমি তার গর্ভের সন্তানের চেয়ে কোনও অংশে কম নই! রোজমেরি আন্টি আমেরিকা চলে গেলেও, বিয়ে করেছেন একজন ফিলাস্তীনিকে। টনি যাহলান। তার বাড়ি এখানেই। হাইফায়।
.

এডওয়ার্ড সাঈদ আঙ্কেলের সাথে আব্বুর নিয়মিত যোগাযোগ হয়। চিঠিতে। ফোনে। আব্বুর মধ্যে চাপা গর্বও কাজ করে, তার ছোটবেলার বন্ধু আর বান্ধবীকে আজ বিশ্বজোড়া মানুষ এক নামে চেনে। আমাদের কাছে তাদের কত গল্প শোনান। আঙ্কেলের ‘ওরিয়েন্টালিজম’ বইটা বলতে গেলে আব্বুর একপ্রকার মুখস্থ! বন্ধুর প্রতি এমন ঈর্ষাহীন শ্রদ্ধা সচরাচর দেখা যায় না! আব্বু আমাকে ছোটবেলায় বলতেন, তোকে আন্টির মত হতে হবে! আম্মু ঝামটা দিয়ে বলে উঠতেন, দরকার নেই আন্টির মত হওয়ার। আমার মেয়ে হবে আমার মেয়ের মতোই! আন্টি কিছুদিন বৈরুতের আমেরিকা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেছেন। আব্বুও চাইতেন আমি ভালভাবে পড়াশোনা করে ওখানে লেকচারার পদে সুযোগ লাভ করি! বারবার শুনতে শুনতে আমার মধ্যেও এ-ধরনের একটা স্বপ্ন চারিয়ে গিয়েছিল! আমাদের পরিবারের একান্ত চাওয়ার বিষয়টাই যখন আলির চাওয়ার সাথে মিলে গেল, সেজন্য চমকে গিয়েছিলাম। অবশ্য আলির চাওয়া আর আমাদের পরিবারের চাওয়া বোধ হয় এক নয়! সে কেন আমার বৈরুত যাওয়ার কথা জানতে চাইল? ওর সাথে একবার সরাসরি কথা বলতে পারলে ভাল হত! কিন্তু তার টিকিটির নাগাল পাওয়াই তো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে!

.

আজ আলিদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ছিলাম। আলি আমার জন্যে খলীল জিবরানের অনেকগুলো বই এনেছে। তার প্রিয় কবি আহমাদ শাওকীর ‘দীওয়ান’ এনেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে আম্মুর প্রিয় কবি ‘মী যিয়াদা’ (مي زيادة)-র কবিতার বই এনেছে! কী মনে করে খলীল জিবরানকে লেখা মী যিয়াদার চিঠির একটা সংকলনও এনেছে! উপহারের স্থানে আম্মুকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে:

‘‘একজন গুণী মানুষের বই, আরেকজন গুণী পাঠকের জন্যে’’!

আম্মু মন্তব্যটা পছন্দ করেছেন। আলাদা করে জানতে চেয়েছেন আলি সম্পর্কে। আমার জন্যে নিয়ে আসা ‘শাওকিয়্যাতে’ আলি লিখেছে:

যিয়াদাহ!

“তোমার অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতটা বেশি আলোকিত হোক, দিনদিন তোমার আলো ‘যিয়াদাহ’ হোক’’!

মন্তব্যটা আম্মুর চোখে পড়েছে! তিনি পড়ার পর ভ্রু কুচকে কিছুক্ষণ কী যেন ভেবেছেন! আমার দিকেও আড়চোখে তাকিয়েছেন! তিনি কি কিছু একটা সন্দেহ করছেন? আমার মনেও একটা প্রশ্ন কুনকুন করছে, আলি কি কিছুর দিকে ইঙ্গিত করে কথাটা লিখেছে? তার সবকিছুই কেমন যেন হেঁয়ালী ভরা! আমার সাথে কথা বলে না, দেখা করে না, অথচ আমার সব খবর তার নখদর্পনে! তার সাথে পরিচয়টা এত সুন্দরভাবে হল! সেটা আরো কত সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে পারত! অথচ তার কোনও হেলদোলই নেই! কেমন গা ছাড়া ভাব।

.

কবিতার বই আর চিঠির সংকলনটা পেয়ে আম্মুর আনন্দ আর ধরে না। চিঠিগুলো বারবার পড়ছেন। আব্বু চান আমি ভার্সিটির অধ্যাপক হই! আম্মু চান, আমি যেন তার প্রিয় কবির মত এক পরিপূর্ণ কবি হই! আমার নাম রাখা নিয়েও আব্বু-আম্মুর সে কি মন কষাকষি! আব্বু চেয়েছিলেন, আমার নাম হবে ‘রোজমেরি’! সঙ্গত কারণেই আম্মু রেগে কাঁই! আব্বু বুদ্ধিমান মানুষ! আপোষের পথে হাঁটলেন! আম্মু তার প্রিয় কবির নামেই আমার নাম রেখেছেন। নামটা আমারও বেশ পছন্দের! আব্বু যখন আমাদেরকে নিয়ে নাজারেথে গেলেন, রোজমেরি আন্টির বাসায়, আম্মু সেখানে যেতে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। শুধু ভদ্রতা রক্ষার্থে গেলেন। আম্মুর আগ্রহ অন্যখানে! মী যিয়াদার বাড়ির দিকেই আম্মুর আগ্রহ! কবির বাড়িও এ পবিত্র শহর নাজারেথেই! আম্মুর মধ্যে বোধ হয় এক ধরনের হতাশা কাজ করে, তার মধ্যেও কবি হওয়ার প্রবণতা ছিল। সেটা চরিতার্থ করতে না পেরে, অন্যের মাঝে ও মেয়ের মাঝে সে প্রতিচ্ছবি খুঁজে বেড়ান!

.

১০-ই এপ্রিল ১৯৭৪

প্রতিজ্ঞা করি প্রতিদিনই দিনলিপিতে কিছু না কিছু লিখব! সেটা আর হয়ে ওঠে না। লিখতে বসলেই রাজ্যের ঘুম এসে দু’চোখে ভর করে। নানা কাজের কথা মনে পড়ে যায়! লেখার চেয়ে লেখার বিষয় নিয়ে ভাবতেই ভাল লাগে! নেশা নেশা লাগে! এই যে গতকাল আলিদের ওখানে গিয়েছিলাম। অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুই ঘটেছে। কতদিন পর দেখলাম আলিকে! আলির আম্মু বলেছেন:

-আলি আর এখানে আসতে পারবে না। তুমি লুবনানে যাবে বলেছিলে না! তুমি গেলে তার ভাল লাগবে! তোমার কোনও সহযোগিতা লাগলেও সে করতে পারবে! ভার্সিটিতে ভর্তি ও থাকা-খাওয়ার সুন্দর বন্দোবস্ত করে দিতে পারবে! তুমি চাইলে মুসলিম বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিবে, খ্রিস্টান বাড়িতেও করে দিতে পারবে!

-আমার থাকার ব্যবস্থা আছে!

-সেই ফিলিপ খুরীদের বাড়িতে? আলি বলেছে, তাদের বাড়ি শেমলানে। বৈরুত থেকে ২৫ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে! এতদূর আসা-যাওয়া করতে পারবে নিয়মিত? তোমার কষ্ট হয়ে যাবে না? এজন্যই আলি ভিন্ন ব্যবস্থার কথা ভেবেছে!

-আচ্ছা, আমি এ-বিষয়ে পরে জানাব! আলি এখানে আসতে পারবে না কেন?

-নিরাপত্তাজনিত কারণে। তাকে ইহুদি গোয়েন্দারা খুঁজছে! বৈরুতেও তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়!

-আলি কি গোপন কিছুর সাথে জড়িত?

-যাদের পিতা বা কোনও আত্মীয় ইসরায়েল বিরোধী যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, তাদের একটা তালিকা আছে। এদেরকে সব সময় দেখে দেখে রাখা হয়। তারা প্রতিশোধমূলক কিছু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কি না, যাচাই করে দেখা হয়। তা ছাড়াও আলির স্বাধীনচেতা যুবক! তার চিন্তা আমাদের পরিবারের বাকি দশজনের চেয়ে আলাদা! সবাই যেখানে ইহুদিদের সাথে আপোষ করে থাকতে আগ্রহী, আলি সেখানে

ইহুদিদেরকে একচুল ছাড় দিতে নারাজ! এজন্যই তার দাদা তাকে বৈরুত পাঠিয়ে দিয়েছে! এখানে থাকলে বেঘোরে বুলেটের আঘাতে মারা পড়ে! কিন্তু ওখানে পাঠিয়ে হিতে বিপরীত হয়েছে! যে ভয় থেকে বাঁচার জন্যে তাকে বৈরুত পাঠানো হয়েছে, সেখানে ভয়টা আরো বেশি করে দেখা দিয়েছে! সে এখন আত্মগোপন করে থাকে! লুকিয়ে থেকেই সে অনেক কাজ করে! এখনো পর্যন্ত গোয়েন্দারা তার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য পায়নি! শুধু সন্দেহ করে! নইলে আরো আগেই ধরে ফেলতো! এসব কথা এখন থাক। আলি তার দু'টো ইচ্ছার কথা আমাকে বলেছে। তোমাকে বলতে বলেছে!

-কী ইচ্ছা?

-একটা ইচ্ছা হল, তুমি এখনই বৈরুত না গিয়ে আরো কিছুদিন পরে যাবে! ততদিন নিয়মিত আমাদের বাড়িতে আসার চেষ্টা করবে! আমাদের সাথে কিছুটা সময় কাটিয়ে যাবে! পাশাপাশি পড়াশোনাও করবে!

-এটা তো এখনো করছি! আলাদা করে ইচ্ছাটা কেন প্রকাশ করল?

-তোমার প্রশ্নের উত্তরটা আলির দ্বিতীয় ইচ্ছের মধ্যে আছে!

-দ্বিতীয় ইচ্ছেটা কী?

-সেটা এখন বলা যাবে না! সময় সুযোগমত পরে বলব! অথবা বলার প্রয়োজন হবে না! তুমিই বুঝে নেবে!

-ঠিক আছে!

.

০৯ জুন ১৯৭৪

আমি এখন বৈরুতে। গতকাল এসে পৌঁছেছি। পরিবারের সবাই এসেছে। ভেবেছিলাম ভাইয়া আসবে না। ধারনা ভুল প্রমাণ করে তিনিও এসেছেন। বৈরুতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছি। গত দু'মাস তুমুল যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গেছে। ঘরে বাহিরে উভয় স্থানে। মুসলমানদের সাথে ইসরায়েলি সেনাদের সংঘর্ষে পরিস্থিতি আগুনের মতো হয়ে গিয়েছিল। নিয়মিত আলির আম্মুর কাছে যেতে পারি নি। গত একমাস ঘর থেকেই বের হতে দেননি আব্বু-আম্মু। ভাইয়া তাদেরকে কী বুঝিয়েছেন কে জানে! তারা আমাকে ও বাড়িতে যেতে দেন নি। দ্রুত বৈরুত আসার তোড়জোড় করেছেন । মনটা বড় বেশি জ্বলছে, আলির মায়ের সাথে দেখা করে আসতে পারলাম না। বিদায় নিয়ে আসতে পারলাম। অনেক অসম্পূর্ণ কথার পূর্ণতা দিতে পারলাম না। আলি প্রথম ইচ্ছানুযায়ী আমি তার মায়ের সাথে থেকেছি! কখনো কখনো রাতেও থেকেছি। বাড়িতে মিথ্যা বলতে হয়েছে মাঝেমধ্যে। কিন্তু এছাড়া উপায় ছিল না। মহিলার মধ্যে মা মা ভাব ছাড়াও এমন একটা কিছু ছিল, চুম্বকের মতো টানতো! যে কয়দিন যেতে পেরেছি, তিনি আমাকে গল্পচ্ছলে অনেক কথা বলেছেন। কুরআন পড়ে শুনিয়েছেন। মুখস্থ! অবাক কা-! তার পুরো কুরআনই কণ্ঠস্থ! আমি বাইবেলের দুয়েকটা লাইন ছাড়া বেশি কিছু পারি না! অল্প ক'দিনের মধ্যে তিনি আমার কাছে পুরো ইসলাম তুলে ধরেছেন। খ্রিস্টবাদ ও ইসলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন। আশ্চর্য, একটা মানুষ সারাজীবনে পর্দার আড়ালে থেকে, এত কিছু কিভাবে জানলেন! কিভাবে শিখলেন? প্রশ্নটা করেছিলাম তাকে! তিনি মিষ্টি হেসেছেন! কিছু বলেননি। পরে একদিন বলেছিলেন, স্বামী শহীদ হওয়ার পর অনেক প্রস্তাব এসেছিল, তিনি গ্রহণ করেননি। সন্তানের পেছনেই বাকি জীবন ব্যয় করবেন বলে ঠিক করেছেন। পড়াশোনা করবেন, এতীম শিশুদের শিক্ষার জন্যে কাজ করবেন। মসজিদুল আকসায় মেয়েদের কুরআন বিষয়ক হালকা হয়, সেগুলোতে সময় দেবেন। এর সবগুলোই তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। আমার কাছে অবাক লেগেছে, মেয়েদেরও কুরআনী হালকা হয়?

-কেন হবে না! কুরআন শিক্ষা করা, ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের উপর সমানভাবে ফরয!

-আমি দেখতে যেতে পারব?

-নিয়ে যাব একদিন তোমাকে!

-আপনাদেরকে কে পড়ান?

-কেউ পড়ায় না! আমরাই পড়ি! ওখানে যারা আসেন, সবাই শিক্ষিত! পুরুষদেরকে অনেক সময় ইহুদি সেনারা প্রবেশ করতে দেয় না, তাই নারীরাই মসজিদে আকসায় কুরআন শিক্ষার ধারা অব্যাহত রেখেছে! তাদের কারো কারো কুরআনি জ্ঞান দেখলে হয়রান হয়ে যাবে! আমাদের প্রামান্য যুগের বড় বড় তাফসীরের কিতাব তাদের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখস্থ! একটা আয়াত বললে, সেটার তাফসীর, কয়েকটা কিতাব থেকে মুখস্থ বলে দেয়।

-আমাদের বাইবেল নিয়ে এমন কিছু কল্পনাও করা যায় না।

.

তিনদিন পর মসজিদে আকসায় গেলাম। ভেবেছিলাম এত বাধা ডিঙিয়ে ক'জনই-বা আসবে! ওখানে গিয়ে দেখি মহিলা গিজগিজ করছে। সবার হাতে কুরআন শরীফ আর খাতা। একটা আয়াত পড়া হচ্ছে, বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে আয়াতটা সম্পর্কে যা লেখা আছে, যার যার সাধ্য অনুযায়ী বলে দিচ্ছে। মুখস্থ। আলি আম্মুকে দেখলাম অনেকগুলো তাফসীর থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। কেউ মুখস্থ বলার সময় ভুল করলে, সংশোধন করে দিচ্ছেন! তাদের মুখ থেকে শুনতে শুনতে অনেক কিতাবের নাম মুখস্থ হয়ে গেছে! পুরো সময় জুড়ে শুনছিলাম আর ভাবনার অতলে ডুবে যাচ্ছিলাম, এদের মধ্যে এত জ্ঞানচর্চা, তবুও পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে কেন? ঘোরের মধ্যে সেদিনের কুরআনি হালকা শেষ হলো। ভীষণ অতৃপ্তি নিয়ে ঘরে ফিরলাম। ভেতরের ফটফটানি দেখে বুঝতে পারলাম, আমাকে আবার যেতে হবে ওই অপার্থিব

জ্ঞানচর্চার হালকায়! মহিলারাও নিজ ধর্ম সম্পর্কে এত এত জানে? এতকিছু মুখস্থ রাখা সম্ভব? এত সুন্দর করে বিতর্ক করা যায়? রাগারাগি না করে? গলার স্বর উঁচু না করে? কেউ নিজের জ্ঞান জাহির করতে চায় না। পারলে বিনয়ের সাথে বলে দেয়, না পারলে অন্যের কাছ থেকে শুনে নোটবইতে টুকে নেয়। এরা কেন এত গুরুত্ব দিয়ে পড়ছে? পরীক্ষা দিবে? নাহ! এটা নিখাদ জ্ঞানচর্চা! অহেতুক গল্পগুজব আড্ডা নয়। অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে চা-পানের বিরতি হয়! তখন গল্প-গুজব হয়। অকাজের নয় কথা নয়, সবই কাজের! এতদিন আলির আম্মুর কাছে গল্প শুনে ইসলামের প্রতি আমার যতটা দুর্বলতা তৈরী হয়েছিল, এখানে কুরআনি হালকায় একদিন এসেই তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দুর্বলতা তৈরী হয়েছে। নিজের চিন্তা-বিশ্বাসকে অসার ঠুনকো আর খেলো মনে হতে লাগল!

.

বিপদ দেখা দিল দ্বিতীয় দিন। হালকা থেকে ফেরার সময় ভাইয়া আমাকে দেখে ফেলেছে। তারপর থেকেই আমি একপ্রকার ঘরবন্দী! তার রেশ ধরেই এখন বৈরুতে! কুরআনি হালকার মিষ্টি আমেজে আমি আলির কথাও ভুলতে বসেছিলাম। দু'দিন হালকায় বসে, যা যা শুনেছিলাম, বেশিরভাগ মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কী সুন্দর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ! খটমটে রসকষহীন কোনও জোর-যবরদস্তিমূলক চাপিয়ে দেয়া মতামত নয়! ভদ্রমহিলাদের প্রতিটি কথাই যুক্তিসঙ্গত আর গ্রহনযোগ্য লেগেছে! ত্রিত্ববাদের ধাঁধাঁলো কুহেলিকার লেশমাত্র নেই!

.

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

ভার্সিটিতে ভর্তির কাজ শেষ হয়েছে সেই কবে! যখনই বাইরে বের হয়েছি, দু'চোখ শুধু একজনকে খুঁজে বেরিয়েছে! এত লোকের ভীড়ে কাউকে পাওয়া কি সম্ভব? ভার্সিটিতেও কতজনকে জিজ্ঞেস করেছি। আমাদের ফিলিস্তীনের অনেক ছেলে মেয়ে পড়ে। তাদের কাছে আলির কথা জানতে চেয়েছি, কেউ চেনে না। দিনগুলো পানসে হয়ে কাটছে। প্রতিদিনই আশায় বুক বাঁধি, আজ বোধ হয় দেখা হবে! দিন শেষ হয়ে যায়! আবার নতুন আশা নিয়ে ভোর আসে। এখন দিন তারিখের হিশেব থাকে না। আজ ঘরে ফিরছিলাম! বাসে নিজে আসনে বসে আছি! জানলা দিয়ে একটা কাগজ এসে কোলের উপর পড়ল। চমকে উঠলাম! খুলে দেখি, আলি হাতের লেখা! বুকের রক্ত ছলকে উঠল! মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল! দ্রুত মাথা বের করে দেখলাম! তেমন কাউকে চোখে পড়ল না! কাগজটাতে পরিচিত হস্তাক্ষর জ¦লজ¦ল করছে:

"দ্বিতীয় ইচ্ছেটা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন? পারলে আগামি আঠাশ তারিখে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে আসবেন! শেষ গন্তব্য পর্যন্ত বাসে বসে থাকবেন"

পুরো রাস্তা জুড়ে উথাল-পাতাল চিন্তা! দ্বিতীয় চিন্তা কি বিয়ে নাকি মুসলমান হওয়া? অথবা উভয়টা? যেটাই হোক, আমি সবটাতে রাজি! সেই কবে থেকে! আলির আম্মুকে সবকিছু খুলে বলার সুযোগ না পেলেও, তিনি আভাসে-ইঙ্গিতে অনেক কিছুই ধরতে পেরেছেন। কিছু বিষয় জিজ্ঞেস করেও জেনেছেন। আমার মধ্যে দ্বিধার কিছু ছিল না। আরেকবার কুরআনি হালকায় যেতে পারলে, এতদিন অপেক্ষা করতে হত না। আরো কয়েকমাস আগেই অনেক কিছুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যেতাম! এখন শুধু প্রতীক্ষা!

.

৪-ই নভেম্বর ১৯৭৪

দীর্ঘদিন পর কলম নিয়ে বসলাম! স্মৃতিগুলো ধরে রাখা যাক! চিরকুট পাওয়ার রাতে শুয়ে ঘুম আসছিল না! এমন প্রতীক্ষার রাতে কারো ঘুম আসে! এপাশ ওপাশ করে রজনি কেটে গেল। ভোরে উঠেই মনে হল, এখুনি বেরিয়ে পড়ি! আবেগ দমন করতে হল! এত আগে বের হয়ে কী লাভ! যেতে হবে তো ভার্সিটির পর! একেকটা সেকেন্ড যেন একেক ঘণ্টা! ফুরোতেই চায় না! সময়মত বাসে উঠে বসলাম! চোরা চোখে আশেপাশে দেখছি! না, তেমন কেউ নেই! সবাই ভার্সিটির প্রতিদিনের যাত্রী! মনে হয়, শেষ স্টপেজেই আমার অপেক্ষা করবে! বাস চলছে! থামছে! আমাদের বাসে যাত্রী ওঠে না, শুধু নামে! শেষের দিকে বাস প্রায় খালি হয়ে গেল! পুরো বাসে গুটিকয়েক ছাত্র-ছাত্রী। বাস থামল! একজন ছাত্র নামবে! কোত্থেকে যেন কাগজের একটা দলা এসে পড়ল! দ্রুত খুলে ফেললাম:

" মেয়েটির সাথে চলে আসুন"

কোন মেয়ে? বাসে সবমিলিয়ে আছে তিনটি মেয়ে! এদের কারো সাথে? বাস আবার ছেড়ে দিয়েছে! হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি! যা হওয়ার হবে! আরো তিনটা স্টপেজ বাকি আছে! অন্যমনস্ক হয়ে বসে বসে ভাবছি! বৈরুত এখনো আমার কাছে নতুন! জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছি! বাস আবার থামল! কে একজন বলল:

-যিয়াদাহ, নেমে পড়!

কথাটা কে বলল সেটা দেখার অপেক্ষা করলাম না! নেমে গেলাম! উত্তেজনার পাশাপাশি অন্য রকম এক আনন্দ হচ্ছিল! এতদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে! কত কতদিন পর তাকে দেখব! তার সাথে কথা বলব! মুখোমুখি হব অদ্ভুত মানুষটার! অপরিচিত থেকে অতি আপনজনে পরিণত হবে! বাস থেকে নামতে নামতেই মাথায় এসব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল! বাস চলে গেছে! বোরকা পরা এক মহিলা এসে, মৃদুস্বরে প্রশ্নের ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল:

-যিয়াদাহ?

-জি¦!

আমি উত্তর দেয়ার আগেই, আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল! একটু পর হাত ছেড়ে দিয়ে আপন গতিতে হাঁটতে লাগল! যেন আমাকে

চেনেই না। আমার ভারি আমোদ হচ্ছিল! কেমন গোয়েন্দা গোয়েন্দা ভাব! নানা পথ পাড়ি দিয়ে একটা ঘরে প্রবেশ করলাম! বোরকা পরা মেয়েটা আমাকে দ্রুত পোষাক বদলে নিতে বলল! একটা বোরকা দিল! পরে নিলাম! সবকিছু একদম মাপমত হয়েছে! মনে পড়ল, আলি মা আমার জামা-কাপড়ের মাপ নিয়েছিলেন একবার! সেটা তাহলে এজন্য! ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলাম:

-আলি কোথায়?

-আছে! একটু পরেই দেখা হবে!

বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে আবার বের হয়ে এলাম। আবার দীর্ঘক্ষণ হাঁটার পর, একটা ঘরে এসে হাজির হলাম। গাঢ় অন্ধকার! হাতড়ে হাতড়ে হাঁটলাম। কেউ একজন এসে আমার হাতটা কোমলভাবে ধরল! সুন্দর করে সাজানো-গোছানো একটা কামরায় প্রবেশ করলাম! উজ্জ্বল আলোতে দেখলাম, অত্যন্ত মিষ্টি চেহারার একটা মেয়ে আমার হাত ধরে রেখেছে! সোপায় বসলাম। একে একে অনেক মহিলা এলেন। আমাকে এত আদর করে আপ্যায়ন করলেন, মনে হল আমি একজন রানী। আমার চেয়ে বয়েসে একটু বড় একজন আমাকে কালিমা পড়ালেন। সবাই মিলে দু'আ করলেন। আলির সাথে বিয়েতে আমার সম্মতি আছে কি না, জানতে চাইল! মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম! আলির সাথে বিয়ে হলে, কী কী সমস্যা হতে পারে, তার একটা ফিরিস্তি তুলে ধরল!

-বাবা-মায়ের সাথে বাকী জীবন দেখা হওয়া অনিশ্চিত!

-ইসলাম গ্রহণ করার পর, এমনিতেই সেটা অনিশ্চিত হয়ে গেছে!

-সব সময় গোপন জীবন যাপন করতে হবে!

-সেটা বিয়ে না করলেও হবে!

এমনি আরও কিছু আশংকা তুলে ধরল। আমি জানালাম এসব আমাকে আগেই আলির আম্মু বলেছেন। আমার দিক থেকে কোনও দ্বিধা নেই। এমনকি আমি যে কোনও সময় বিধবা হতে পারি, সেটাও আলির আম্মু বলেছেন!

.

আমি অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম আসল মানুষটার জন্যে। তারই যে দেখা নেই! অবশেষে অবসান ঘটল। তিনি এলেন। তাকে দেখে কানায় কানায় ভরে উঠল। যেন অনেক দিন পিপাসার্ত থাকার পর, পানি পান করলাম! প্রচণ্ড গরম থেকে আরামদায়ক শীতল কক্ষে প্রবেশ করলাম! সালাম দিলেন। উত্তর দিলেন। সবার কথা জানতে চাইলেন। এতদূর হেঁটে আসতে কোনও হয়েছে কি না, বারবার জানতে চাইলেন। জানালেন, তাকে ইহুদিরা হন্যে হয়ে খুঁজছে! আমার ভাইয়ের কীর্তি শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম! সে নাকি রীতিমতো হোমরাচোমড়া গোছের সিক্রেট এজেন্ট। খ্রিস্টান হয়েও ইহুদিদের হয়ে কাজ করে। মোটা বেতনে।

.

আলি এরপর মূল প্রসঙ্গে চলে এল। তার কিছু সমস্যা তুলে ধরল। বললাম এসব আমি আগে থেকে জানি। নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। বিয়ে হয়ে গেলে, আমরা একে অপরের সমব্যথী হয়ে যাব! জীবনসাথী হয়ে যাব! একে অপরের দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করে নেব! প্রয়োজনে জীবনেরও পরোয়া করব না!

.

বিকেলে বিয়ে হল আমাদের। রাতেই আমরা আরেকটা বাড়িতে চলে গেলাম। ঠিক হল আমরা কিছুদিনের জন্যে সিরিয়া চলে যাব! এদিকের পরিস্থিতি শান্ত হলে ফিরে আসব। আলিদের গোয়েন্দারা খবর দিল, আমি যে বাড়িতে বোরকা পরার জন্যে থেমেছিলাম, সেখানে কারা যেন দরজা ভেঙে ঢুকেছে! শুরু হল আমাদের লুকোচুরির জীবন। খারাপ লাগছিল না। আলি পাশে আছে! এত ঝুঁকির মধ্যেও আলিরা তাদের ইসরাঈল বিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সীমান্ত চৌকিতে অতর্কিতে হামলা অব্যাহত রেখেছে। আমাকে সে সব কিছু খুলে বলত না। আমি আগে বেড়ে জানতে চাইতাম না। আমি শুধু চাইতাম, আলি যেন আমার কাছে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সুখে থাক। নিশ্চিন্তে থাক! আরামে থাক!

.

১৭ নভেম্বর ১৯৭৪

আগে ছিলাম একজন। নিজের মত থাকতাম। এখন দু'জন। দু'জনের মতো থাকতে হয়। আলি এমন মানুষ, তার সাথে থাকতে কারোরই বিশেষ বেগ পেতে হবে না। অন্যের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তার খুব মনোযোগ! আমি বাবা-মা ছেড়ে এসেছি, তার অভাব বোধ করার সুযোগ পাইনি। আলিদের একটা দল আছে। এদের বেশিরভাগই ফিলাস্তীনি। তাদের নিজস্ব একটা জগত আছে। সমাজ আছে। গোপনে এরা অনেক কাজ করে। লেবানন সরকারকে লুকিয়ে। সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে, গৃহস্থালি কাজ পর্যন্ত এখানে সেখানো হয়। ছেলেমেয়েদেরকে ছোটবেলা থেকেই যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়। যাতে তারা মসজিদুল আকসার জন্যে লড়তে পারে। ইহুদিদের হাত থেকে কুদসকে মুক্ত করতে পারে। ইহুদি গোয়েন্দারা আলিদের গোপন দল সম্পর্কে আবছা আবছা জানত। তাই তারা হন্যে হয়ে খুঁজত! কিন্তু আলিদের অতি গোপনীয়তার কারণে ইহুদিরা তেমন একটা সুবিধা করে উঠতে পারত না। এদিকে বৈরুতের অবস্থা দিনদিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। বিভিন্ন দলের মধ্যে যুদ্ধ লাগে লাগে অবস্থা। এই ঘোলাটে পরিস্থিতিতে আমাদের একটা লাভ হয়েছে, নিরাপত্তা

সংকট কিছুটা হলেও কমেছে। কিন্তু দেখা দিয়েছে নতুন সমস্যা, বৈরুতের খ্রিস্টান ও শী'আরা ফিলীস্তিনীদের সহ্য করতে পারছে না। বিশেষ করে খ্রিস্টান মিলিশিয়ারা নানাভাবে মুহাজিরদেরকে উত্যক্ত করছে! আলি মনে করছে আপাতত কিছুদিনের জন্যে বৈরুত ছেড়ে বাইরে থাকা নিরাপদ হবে!

১১ মার্চ ১৯৭৫
অনবরত ছোটাছুটি মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। বৈরুতে আর থাকা যাবে না। আপাতত সিরিয়াতে যাওয়া হবে। গৃহযুদ্ধ প্রায় লেগে যাচ্ছে! সীমান্ত পার হওয়া কঠিন কিছু নয়। আলি যেতে চাচ্ছে না। কিন্তু তার উর্ধতন মহল বলছে, সিরিয়াতে গেলে কিছু কাজ হবে। অবস্থার প্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে, বৈরুতে ফিলাস্তীনিদের উপর ভয়াবহ হামলা হবে। চুতুর্দিক থেকে। তার জন্যে সিরিয়া থেকেও বাড়তি সাহায্য লাগবে। আলি গেলে, কাজটা সহজ হবে।

৪ মে ১৯৭৫
কোথাও থিতু হওয়া যাচ্ছে না। আজ হামায় তো কাল হালাবে। পরশু দিমাশকে। এভাবে চরকির মত ঘুরপাক খেতে হচ্ছে। আলি আমাকে কোথাও রেখে যেতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। আমিও তার সাথে থেকে মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে পারব! আর আমাদের নতুন মেহমান আসবে। এ-সময়টা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। এমন কিছু হবে, সেটা আগে থেকেই জানা ছিল। আমার মনে তো এমন আশংকাও ছিল, হয়তো তার সাথে বাসরও হবে না। আল্লাহ তা'আলা তার এই অসহায় বান্দীর প্রতি অনেক দয়া করেছেন। আমাদের জীবনধারাই এমন, দু'জনে একটু নিরালায় বসে কথা বলব, সে ফুরসতও মেলে না। শুধু বিয়ের পরে ক'টা দিন নিরালায় ছিলাম। তাও আলি সারাদিন কোথায় কোথায় চলে যেত। সে চেষ্টা করত রাতটুকু পুরোপুরি আমাকে দিতে। সিরিয়াতে আসার পর, দিনরাত কোন ফাঁকে যে চলে যায়, টেরও পাওয়া যায় না। আমার কাজ হল, বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে কথা বলা। বিভিন্ন দেশে অসহায়ভাবে তাঁবুতে বাস করা, ফিলিস্তীনিদের জন্যে অর্থকড়ি সংগ্রহ করা। আলির কাজ হল, যোদ্ধা সংগ্রহ করা। এর মধ্যেই সময় করে দু'জন একান্ত সময় কাটাই।

৮ আগস্ট ১৯৭৫
গত এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে বৈরুতে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অসহায় ফিলিস্তীনিরা চতুর্মুখি আক্রমণের শিকার! পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। কষ্টে বুক ফেটে চায়। আলি মাঝে মধ্যে অস্থির হয়ে পড়ে! ছুটে যেতে চায় সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিতে। কিন্তু তাকে বারবার বাইরের দায়িত্ব দেয়া হয়। যুদ্ধ করার লোক তো আছে। আলি যেভাবে নতুন সদস্য সংগ্রহ করতে পারে, অন্যরা সেভাবে পারে না। এবার তাকে জর্ডান যেতে হবে। আমাকে সাথে নেবে না বলছে! দেখা যাক!

২১ অক্টোবর ১৯৭৫
আমি এখন দামেশকে থাকি। মুখাইয়ামে ইয়ারমুকে! বিশাল একটা এলাকা জুড়ে অসহায় ফিলিস্তীনিরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাদের মধ্যে শিক্ষার অভাব। অর্থের অভাব। অনেক কাজ করতে হয়। আলি আমাকে রেখেই আম্মানে গেছে। সেখানেও শিশুদের স্কুলগুলোর বেহাল অবস্থা। আমি গেলে ভাল হয়। আমারও ইচ্ছা, ওখানে যাই। আমার ছোট খালা থাকেন সেখানে। আমাকে খুবই আদর করতেন। কী জানি এখন কিভাবে গ্রহণ করবেন।

১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬
ডায়েরিটা ভুলে রেখে গিয়েছিলাম। আলি বলেছিল ক'দিন পরেই আবার দিমাশকে ফিরে আসব। তাই প্রয়োজনীয় জামা-কাপড় ছাড়া আর কিছু নিইনি। আম্মানের দিনগুলো ছিল বৈচিত্র্যময়। এই প্রথম একজন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে দেখা হল। ছোটখালা আশাতীত ভালোবাসা দেখিয়েছেন দু'জনের প্রতি। খ্রিস্টান হয়েও নিজের অলংকার খুলে সাহায্য করেছেন অসহায় মুহাজিরদের জন্যে। নিয়মিতই কিছু দান করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। সুন্দর কিছু সময় কেটেছে তার কাছে।
.
৪ অক্টোবর ১৯৮২
এতবড় বিপর্যয়ের পর, দুনিয়াটাকে পানসে মনে হয়! কিন্তু আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া গুনাহ। কী হবে লিখে? কী লাভ! জীবনের মূল্যই যদি না থাকল! তবুও বাচ্চাদের জন্যে হলেও কিছু কথা লিখে রাখতে হবে। তারা ভবিষ্যতে জানবে! তাদের আব্বু-আম্মু কেমন ছিলেন। উম্মাহর জন্যে কতোটা ত্যাগ করেছেন। হাঁ, আমাদের আপাতত দুই সন্তান! আরেক জনের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি!
.
মানুষ যেটাকে ভাল মনে করে, সেটা তার জন্যে ভাল নাও হতে পারে। আম্মানে খালার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়াও তেমন একটা ঘটনা। ওটা ছিল মারাত্মক ভুল। খালার কাছ থেকে খবর চলে গিয়েছিল বাড়িতে। দিমাশকের সুনির্দিষ্ট ঠিকানা বলতে না পারলেও, মুখাইয়ামে ইয়ারমুকে থাকি, এটুকু তথ্য বাড়িতে পৌঁছেছিল। খালা হয়তো খারাপ কিছু ভেবে বলেন নি। আম্মুকে সান্ত¡না দেয়ার জন্যেই বলেছিলেন: আমি ভাল আছি। সুখে আছি। ভাইয়ার কাছে আমার অবস্থান ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। এতদিনের গোপনীয়তা উদোম হয়ে

গেল। এটা জেনেছি দুর্ঘটনা ঘটার পরে। আগে জানতে সতর্ক হওয়া যেত।

.

আম্মান থেকে ফিরে এসে দিমাশকে আগের ডেরায় উঠেছি। একটা স্কুলে পড়াই। আলি আগের মতো দৌড়াদৌড়ির মধ্যে থাকে। অবাক লাগে একটা মানুষ এতটা আত্মত্যাগ করতে পারে? কোনও লোভ ছাড়া। নিজের জন্যে কোনও উচ্চাশা করা ছাড়া! বুকটা গর্বে ভরে যায়! আল্লাহর কাছে অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করি। ভাগ্যিশ সেদিন ভোরে চার্চে গিয়েছিলাম। নইলে কি এমন সোনার হরিণ এসে ধরা দিত! আলি বলে উল্টো কথা! সেই নাকি সৌভাগ্যবান! তার ভাগ্য, সেদিন দাদুর সাথে এসেছিল! নইলে এমন একটা 'রত্ন' সে কোথায় পেত! সে এমনভাবে বলে, শুনে মনটা অপার প্রাপ্তিতে ভরে যায়! নাইবা হল স্থায়ী ঠাঁই! নাইবা হল নিরাপদ একটি নীড়! একসাথে স্বামীর ভালোবাসা আর উম্মাহর জন্যে কিছু করতে পারা, এটার কোনও তুলনা হয়!

.

আমাদের বড় ছেলে, ইউসুফ। প্রতিদিন মাদরাসায় যায় সবার সাথে। সেদিন আর ফিরল না। আলি তখন হালাবে গেছে। চারদিক খুঁজেও পাওয়া গেল না। মনটা ভেঙে পড়তে চাইলেও, কষে শক্ত করলাম। এভাবে একটা ছেলে হারিয়ে যাবে! আলি থাকলে সে আরও বেশি করে খোঁজ-খবর করতে পারত! প্রায় দশদিন পর একটা চিঠি এল। ভাইয়া লিখেছে! ইউসুফ তার নানীর কাছে আছে। আমি ফিরে না গেলে, তাকে আর পাব না। শত কষ্টের মাঝেও এটুকু প্রবোধ মিলল, যাক ছেলেটা খারাপ থাকবে না। কিন্তু আমার ফেরা সম্ভব নয়। সবাই হয়রান হয়ে গেল, তাকে কিভাবে নিয়ে গেল? ভাইয়া তাহলে, আমাদের পেছনে লেগেই ছিল এতদিন!

.

আলিকে লোক মারফতে জানালাম সবকিছু। আলি বলল, তাহলে এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। ঠিকানা বদলাতে হবে। নতুন কোথাও। আলিরও এখানে আসা ঠিক হবে না। উপরের নির্দেশে আমরা আবার ফিরলাম বৈরুতে। বৈরুত তখন বারুদের বাক্স। কে নেই এখানে? খ্রিস্টান মিলিশিয়া, শী'আ, সুন্নী, ফিলিস্তীনি, লুবনানের সরকারী বাহিনী, ফ্রান্স, আমেরিকা! বাকি ছিল ইসরায়েল! তারাও শেষে এসে যোগ দিয়েছে! মরছে অসহায় ফিলাস্তীনি ভাইবোনেরা!

.

বৈরুতের দিনগুলো কাটছিল, সব সময় মৃত্যুকে হাতে নিয়ে। আলি ফিলিস্তীনিদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। আমাকেও থাকতে হয়েছে পাশে পাশে। মাঝেমধ্যে যুদ্ধফ্রন্ট ছেড়ে অন্য দিকেও কাজ করতে হয়েছে। আহতদের সেবা দিতে হয়েছে।
ইহুদি সেনারা এসে হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে ফিলিস্তীনিদের উপর। সাথে আছে খ্রিস্টান সন্ত্রাসীরা। স্মরণকালের ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে সাবরা-শাতিলায়! হাজার হাজার অসহায় মানুষকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে, তিনদিন ধরে একনাগাড়ে হত্যা করে গেছে! এভাবে নিরপরাধ মানুষের উপর গণহত্যা চালানো, পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল! আমরা সবাই কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলাম!

.

সাবরার গণহত্যার আগের দিন, মানে ১৫-ই সেপ্টেম্বর, আমাদের বাসার সামনে একটা পাগলকে, ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। প্রথম দিকে চোখে পড়েনি। এক পাগলটার প্রশংসা করার পর, আলাদা করে নজরে এল। দেখেই কেমন চমকে উঠলাম! পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা আর মুখটা দাঁড়িগোঁফে ভর্তি হলেও চেহারাটা কেমন চেনা চেনা লাগল! আমি কাছে গিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম! আমাকে কাছে যেতে দেখে, পাগলটা কেমন একটা অন্যমনস্ক ভঙ্গি করে উল্টো দিকে এলোমেলোভাবে হাঁটতে শুরু করল। আমি তার পিছু নেয়া সমীচিন মনে করলাম না। পরে বুঝতে পেরেছি, ওটা ছিল আমার জীবনের দ্বিতীয় বড় ভুল! প্রথম ভুলটা ছিল খালার বাসায় যাওয়া!
পাগলটার পিছু নিলে জানতে পারতাম, ওটা আর কেউ নয়, আমার ভাই! আমাদেরকে ট্রেস করার জন্যে এসেছিল। চিনেছি কী করে? রাতে আলিকে পাগলটার কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, তাকে চেনে। মানে দেখেছে! কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার মাথায় এল, এই লোক হাঁটার ভঙ্গিটা ভাইয়ার সাথে মিলে যায়! তারপরও নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলা ঠিক নয়। কী মনে করে আলিকে আশংকার কথা বললাম! আলি শোনার সাথে সাথে শোয়া থেকে উঠে গেল! চিন্তিতভাবে একটু পায়চারি করে বলল, আমাদের আর এই বাসায় থাকা এক মুহূর্তও নিরাপদ নয়। ইশ এ-আশংকার কথাটা যদি আসার সাথে সাথে বলতে! চলো চলো, দেরী করা যাবে না!

.

আমার হাতে ছোট্ট একটা ব্যাগ দিয়ে, মুহাম্মাদকে আলি কোলে নিল! আরেকটা ব্যাগে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল! বের হওয়ার আগে সব সময় যা করি, বাতি নিভিয়ে আলি জানলা দিয়ে বাইরে রাস্তার দিকে তাকাল! সাথে সাথে লাফিয়ে ঘরে ঢুকল! অত্যন্ত ব্যস্ত স্বরে বলল!
-যিয়াদাহ, তুমি মুহাম্মাদকে কোলে করে পেছনের দরজা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে যাও! আমি একটু পরে আসছি! বের হয়ে আমার অপেক্ষা করবে না! সোজা 'দ্বিতীয় বাড়িতে' চলে যাবে! আল্লাহ চাহেন তো ওখানে আমাদের দেখা হবে! ইনশাআল্লাহ! নইলে......
-নইলে কি?
— না কিছু না, তুমি যাও! দেরী করো না! তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!
-আমি একা যাব না!
-একা কোথায়, মুহাম্মাদ আছে, আরেকজন মেহমান কিছুদিন পরেই আসছে ইনশাআল্লাহ!

-তুমিও আমার সাথে চল!
-যিয়াদাহ! তুমি কি পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারছ না? কেউ একজনকে এখানে থাকতে হবে! ওদের এখানেই ঠেকাতে হবে! নইলে কেউই বের হতে পারবে না!
.
আহা, এমন পরিস্থিতিতে কখনো পড়বো, কল্পনাও করিনি। বড় সন্তান থেকেও নেই। এখন স্বামীকেও….! চিন্তার সময় নেই! আলি আমাদেরকে একপ্রকার ধাক্কাতে ধাক্কাতেই পেছন দরজার কাছে নিয়ে এল! মুহাম্মাদকে কোলে তুলে চুমু খেল! যাওয়ার আগে বলে গেল;
-অনেক করে চেয়েছিলাম, তোমাকে সুখী করতে! চেষ্টার কমতি করিনি! স্বামীর হক আদায়ে ভুল হলে দয়া করে মাফ করে দিও! আমাকে ভালবেসে তুমি পার্থিব অনেক বড় বড় প্রাপ্তিকেও তুচ্ছ করেছ! তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই! তোমার মত একজন মহীয়সী পাশে না থাকলে, আমার এ-পথে টিকে থাকা দুরূহ হয়ে যেতো! বাচ্চাদেরকে সঠিক দ্বীন শিক্ষা দিও! বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের জন্যে গড়ে তোল! ওদের আব্বুর কথা তাদেরকে বলো! ইউসুফের সাথে যদি কখনো তোমার দেখা হয়, তাকে আমার ভালোবাসা জানিও!
.
নয়মাসের আসন্নপ্রসবা একজন নারীর একা একা হাঁটাই কষ্টকর, তার উপর মুহাম্মাদকেও কোলে নিতে হয়েছে! বড় কষ্ট হচ্ছিল! কিন্তু আমাকে হাঁটতেই হবে! গলিটা পার হতেই পেছন থেকে ব্রাশ ফায়ারের কর্কশ ধ্বনি ভেসে এল! সাথে সাথে গ্রেনেড বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ! না থেমে চলতে থাকলাম! থমকে গেলে চলবে না! এগিয়ে যেতে হবে আরো বহুদূর! আমাদের সন্তানদের বাঁচাতে হবে! বাবার রেখে যাওয়া পতাকা তাদের হাতে তুলে দিতে হবে! কুদসকে মুক্ত করতে হবে!

– Atik Ullah